পাঠ পর্যালোচনা বিষয়ক সাময়িকী

প্রেক্ষা

তৃতীয় সংখ্যা

পাঠ পর্যালোচনা বিষয়ক সাময়িকী

প্রেক্ষা

তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদনা
মাসুম বিল্লাহ আরিফ

সম্পাদনা সহযোগী
সোহান আল মাফি
ফরহাদ হাসান
সুলতানা ইয়াসমিন

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস
মাসুম বিল্লাহ আরিফ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চের একটি প্রকাশনা

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০২০

সম্পাদকীয়

কালের যাত্রার ধ্বনি শোনার আগ্রহ মানুষের প্রবল। তারা জানতে চায় পৃথিবীর অতীত কেমন ছিল। কিন্তু আমরা বাস করি বর্তমানের বৃত্তে। সময়ের এই বৃত্ত ভেঙ্গে অতীতকালের ধ্বনি শুনতে আমরা যার আশ্রয় নিই, তা হলো- 'বই'। কারণ বইয়ের কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে অতীত বাঁধা পড়ে। বই খুললেই কালের কলধ্বনি শুনতে পায় পাঠক।

বইয়ের দুনিয়ায় বিশাল একটি অংশজুড়ে ধর্মগ্রন্থ, পুরাণ, উপকথা এসবের অবস্থান। ***'প্রেক্ষা'***র তৃতীয় সংখ্যাটি আমরা সাজিয়েছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ***'আমাদের মহাভারত'*** বইটির পাঠ পর্যালোচনা দিয়ে। পাঠক বইটি পড়ে কী ভাবছেন, কতটুকু আনন্দ পেয়েছেন, বইয়ের কোন দিকটি তাকে মুগ্ধ করেছে, কষ্ট দিয়েছে, আশাহত করেছে, এছাড়া পাঠ শেষে শিখনের হিসেব-নিকেশসহ আরো বৈচিত্র্যে ভরপুর পাঠ পর্যালোচনাগুলো মুখিয়ে আছে আপনার পাঠের অপেক্ষায়।

আর হ্যাঁ, আরো একটি কথা- আমরা চলতি সংখ্যা থেকে 'পাঠ প্রতিক্রিয়া'র স্থলে 'পাঠ পর্যালোচনা' পরিভাষাটি ব্যবহার করবো। কারণ দ্বিতীয়টি শ্রুতিমধুর এবং এর পরিধি আরো ব্যাপক।

সূচীপত্র

০৪ **ঘটনার ঘনঘটা** - *মাসুম বিল্লাহ আরিফ*
০৮ **আমি ও টুবলু** - *ফরহাদ হাসান*
০৯ **আমাদের দ্রৌপদী** - *আল ইমরান*
১২ **আরো কিছু তথ্য** - *রোকেয়া নাসরিন*
১৪ **চরিত্রের হুটোপুটি** - *সুলতানা ইয়াসমিন*
১৫ **মহাভারতের শিক্ষা** - *প্রার্থী ঘোষ*
১৮ **প্রশ্ন তোলা যায়** - *সোহান আল মাফি*
২০ **কার ক্ষমতা বেশি?** - *সানজিদা আক্তার*
২২ **প্রিয় চরিত্র কর্ণ** - *ফাতেমা জাফর প্রিয়া*
২৩ **অবশ্য পাঠ্য বই** - *অনন্যা বড়ুয়া*
২৪ **খটকা!** - *শাকিল আহমেদ*
২৫ **যদি সত্য হতো! -** *জান্নাতুল ফেরদৌস সাকী*
২৬ **গল্পে গল্পে ইতিহাস** - *শাহীনুর আক্তার*
২৭ **পাঠকের আপসোস** - *লুৎফা আকন্দ*
২৮ **সত্যবাদী যুধিষ্ঠির** - *নাইমা সুলতানা*
২৯ **দাদুর কিস্‌সা** - *ফাহিমা আহমেদ*
৩০ **অমৃতের স্বাদ** - *জান্নাতুল সাদিয়া পুষ্প*

ঘটনার ঘনঘটা

মাসুম বিল্লাহ আরিফ

মহাভারতের আকর্ষণীয় একটি পরিচয় হলো, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাকাব্য। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থের ঘটনাপ্রবাহে বাস্তব ও পরাবাস্তবতার অপূর্ব বিন্যাস লক্ষণীয়। পৃথিবীজুড়ে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাচীন রূপকথার অস্তিত্ব বিদ্যমান। যেমন- মিশরীয়, গ্রীক, চৈনিক, ভারতীয়। মহাভারত নিঃসন্দেহে ভারতীয় রূপকথার সর্বোৎকৃষ্ট আকর। এসবকে 'পুরাণ'ও বলা হয়- গ্রীক পুরাণ, হিন্দু পুরাণ প্রভৃতি।

রূপকথায় ন্যায়-অন্যায় বিচার অনর্থক। কারণ রূপকথা নিজের গতিতে চলে। না-হলে অস্ত্রগুরু দ্রোণ প্রবল সম্ভাবনাময় একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুল কেটে নিবেন কেন? মহাবীর অর্জুনেরও বা কেন যোগ্যতমকে যুদ্ধে না হারিয়ে অসুন্দর পন্থায় হাঁটতে হবে?

পুরাণের ঘটনায় থাকে অলৌকিক সব ঘটনার ঘনঘটা। একাই তীর ছুড়ে আকাশ অন্ধকার করা, বাজির দানে রাজ্য হারানো, মানব কর্তৃক দেবতাদের পরাভূত করা, ইম্বল কর্তৃক ভাই বাতাপিকে ভেড়া বানিয়ে খাওয়ানো এবং পেট ফুঁড়ে জীবন্ত বের করা, গোস্ত পিণ্ডের টুকরো থেকে কৌরব ভ্রাতাদের জন্ম ইত্যাদি ইত্যাদি।

রূপকথায় সংখ্যার একক 'হাজার'। তাই লক্ষ-কোটি বছর আর সৈন্য সামন্তের হিসেব-নিকেশে পাঠক চমকে ওঠে না। ভীষ্মের প্রাত্যহিক 'দশ হাজার' সৈন্যের বিনাশ সাধন আর কৃষ্ণ কর্তৃক দুর্যোধনকে 'দশ কোটি' নারায়ণী সেনা দানে পাঠক হায় হায় করে না। ভাবে এতো রূপকথার জগৎ, অতো ভেবে কি রূপকথা হয়!

বর্তমানের 'রুপালি পর্দা' আর 'রূপকথার জগতে'র মাঝে এক অদ্ভুত মিল আছে। দুটোতেই পরাবাস্তবতার প্রাধান্য বেশি। আমরা যখন গ্রীক মিথলজি পড়ি, সেখানেও দেখি একই ঘটনা। জিউসের আজব সব কাজ কারবারে ঠাঁসা সেসব গল্প।

মহাভারতের গল্পগুলো দারুণ লাগে পড়তে। রাজরাজড়াদের হম্বিতম্বি আর রাজপুত্রদের অসম্ভব সব শক্তি-সামর্থ্যের কথা অবাক হয়ে আমরা পড়ি। সম্পূর্ণ মহাভারতকে অসংখ্য ভিন্নভিন্ন গল্পের শক্তিশালী বুনন বলা যেতে পারে। তবে গল্পগুলোর মধ্যে কোনো না কোনো আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান।

দ্রৌপদীর জন্য কুবের-সরোবর থেকে ভীমের পদ্ম আনয়ন আর হিড়িম্বার ভীমপ্রীতি মহাভারতের যুদ্ধের ঘনঘটার মাঝেও নির্মল প্রেমের রং ছড়িয়েছে। পাঠক হিসেবে এ দুটি ঘটনা আমার ব্যতিক্রমী ও ভালো লেগেছে।

দেবতা ও ঋষিদের সাথে সুন্দরী মানব কন্যাদের শারীরিক মিলন পাঠকের মনে অস্বস্তির জন্ম দিলেও পাঠককুলের জানা উচিৎ পুরাণে দেবতা-মানবীর মিলন ডাল-ভাতের মতো। যেমন- গ্রীক মিথলজিতে জিউসের যত্রতত্র জৈবিক তাড়না বহু কুমারী মানবীর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আমরা জানি আর না জানি, প্রতিটি বাগধারার পেছনেই একটি গল্প থাকে। বাংলা ভাষার বহু বাগধারা এসেছে মহাভারতের বিভিন্ন গল্প থেকে। যেমন- অগস্ত্য যাত্রা, সিংহ পুরুষ, শকুনি মামা, শিখণ্ডীর খাড়া, শরশয্যা। এছাড়াও রয়েছে আরো বহু। বাগধারার পেছনের গল্পগুলো জানতে আমার খুব ভালো লাগে। 'অগস্ত্যযাত্রা'র ঘটনাটিও বেশ লেগেছে।

মিথলজি হলেও মহাভারতের প্রধান প্রধান চরিত্রগুলোর আচরণে প্রচুর শ্রেণিবৈষম্য লক্ষণীয় এবং নিশ্চতভাবেই তা সমালোচকদের দৃষ্টি কাড়ে। যোগ্যতার শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও একলব্য আর কর্ণ দ্রোণের নিকট প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়নি। কর্ণ অর্জুনের সমকক্ষতা লাভ সত্ত্বেও শুধু জাত তুলে তাকে অপমান করা হয়েছিল। কৌরবদের পক্ষ নেওয়াতে কর্ণকে তো পরোক্ষভাবে পাণ্ডবরাই বাধ্য করেছে।

একলব্যের জন্য খুব দুঃখ হয়। কাশীরাম কহেন,

"হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম/ দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম/ জোড় হাত করি বলে বিনয় বচন/ শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন/ দ্রোণ বলিলেন, তুই হোস নীচ জাতি/ তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি।"

একলব্যকে নিয়ে হরিশঙ্কর জলদাস গোটা একটি উপন্যাস লিখেছেন -'একলব্য'। দারুণ পড়তে।

সমগ্র মহাভারতজুড়েই প্রতাপশালী 'বীর পুরুষদের' আবাধ আনাগোনা। ভীম বা বল্লভ মশাইকে আমার হেব্বি লেগেছে। বাচ্চাকালে কৌরবপুত্রদের নজেহাল করার দৃশ্যটি পড়ার সময় আমার চোখের সামনে এই চরিত্রটি জীবন্ত ছিল। দৈত্য দানবদের পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ফেলা এই বীরের খাবারের বর্ণনাও লেখক বেশ রসালভাবে দিয়েছেন।

একালে পারমাণবিক অস্ত্রের কথা কে না জানে। পারমাণবিক অস্ত্রধারী দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা নাকি তুলনামূলক কম থাকে - বিশ্লেষকগণ এমনটাই বলেন। অশ্বত্থামার 'ব্রহ্মশির' আর অর্জুনের 'দ্রোণদত্ত' অস্ত্র দুটিকে আমার নিকট পারমাণবিক অস্ত্রের মতন লেগেছে। অস্ত্রদুটি পৃথিবী ধ্বংসকারী বিধায় এ অস্ত্র প্রয়োগে অন্যরা তাদের বাধা দেয়।

মহাভারতের হিরো কে আর ভিলেন কে? আবার মূল চরিত্র কোনটি- দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির নাকি অর্জুন? একবাক্যে এসব নির্ধারণ করা মুশকিলের ব্যাপার।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটা বিষয় খুব খোঁচাচ্ছে আমাকে। ভীষ্ম, দ্রোণ এরা কৌরব পক্ষকে নৈতিকভাবে সমর্থন না করেও তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছেন। অর্জুনদের সাফল্য কামনা করেও অর্জুনবাহিনীকে কচুকাটা করেছেন। সেলুকাস।

আবার কথায় কথায় 'অভিশাপ, বর দান, মাতৃআজ্ঞা, পিতৃআজ্ঞা, কথা দেওয়া' প্রভৃতি পুরো ঘটনাকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে।

পরিমিতিবোধের কিঞ্চিৎ অভাব থাকলেও মায়ের নির্দেশ পালন, জেষ্ঠ্যভ্রাতাকে সম্মানের বিষয়টি মহাভারতের অন্যতম একটি দিক। মহাভারতে এতো এতো ঘটনার ঘনঘটা যে, আমরা পাঠকরা দিশেহারা হয়ে যাই চরিত্রগুলোর সম্পর্ক নিরূপণ করতে। আরব্যরজনীতে যেমন গল্পের পিঠে গল্পের আগমন ঘটে ঠিক তেমনি এই মহাভারতেও।

তবে মহাভারত পড়ার দীর্ঘদিনের যে আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা ছিল তার অনেকটাই পূরণ হয়েছে সুনীলের 'আমাদের মহাভারত' পাঠে।

পাঠ প্রতিক্রিয়াটি শেষ করি মাথায় ঘুরতে থাকা একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন রেখে- 'স্বয়ং দেবতাদেরও পরাভূতকারী পাণ্ডবভ্রাতাগণ যখন নরকের আগুনে পুড়ছেন, তখন দুর্যোধন স্বর্গে বসে মৌজ মারছেন, কিন্তু কেন?'

আমি ও টুবলু

ফরহাদ হাসান

সাধারণত 'টুবলু'দের জন্য লিখা কোনো বই যখন পড়তে যাই, তখন সবার আগে নিজের বয়স টের পাই। মনে হয়, আমি বেশ বুড়িয়ে গেছি, ওসব আমার পাঠ্য নয়। কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লিখা 'আমাদের মহাভারত' পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে, এই গল্পের টুবলুদের আমি ছাড়িয়ে যাইনি এখনো। ওদের সাথে একই পাটিতে শুয়ে এখনো গল্প শোনা যায়, শুনতে পারি।

শুরু থেকেই ভাবছিলাম, সবকিছু মনে রেখে রেখে পড়ে যাবো। কিন্তু আমি বারবারই খেই হারিয়ে ফেলেছি, কিছুই মনে রাখতে পারিনি। এক পাতা পড়েছি, কী এক অদ্ভুত আকর্ষণে পরের পাতায় হুমড়ে পড়েছি। পাতার পর পাতা, ঘটনার সূত্র ধরে ঘটনায় হারিয়ে গেছি।

এই খরস্রোতে ভেসে যেতে যেতেও কিছু শব্দ ক্ষণে ক্ষণে জলের মতো উছলে পড়েছে আমার গায়ে, তন্ময়তা ভেঙে দিয়েছে, ক্ষীণ করে দিয়েছে ভেসে চলার গতি। ওই শব্দগুলোকে আমি আগে থেকেই চিনি- আভিধানিকভাবে, এবার তাদের ঘরদোর চেনা হলো। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, অগস্ত্য যাত্রা, খাণ্ডবদাহন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা ইত্যাদি। আমি কেবল এই শব্দগুলোকেই ধরতে পেরেছি, এছাড়া পুরোটাই ভেসে যাওয়া; ঘটনা থেকে ঘটনায়, বিস্ময় থেকে বড় বিস্ময়ে, অবাস্তব থেকে আরো বেশি অবাস্তবে।

ওই যে শেষদিকে এসে সুনীল বিদায় নিল, গতি মন্থর হলো। যেন স্বাভাবিক গতিতে ছুটে চলা একটি নৌকো এক ধাক্কায় থেমে গেল, পরে কোনোরকম সাঁতরে কিনারায় পৌঁছলো।

আমাদের দ্রৌপদী

আল ইমরান

পৃথিবীর চারটি বড় মহাকাব্যের মধ্যেও যেটি সর্ববৃহৎ সেটিই হল মহাভারত। এই পৌরাণিক কাহিনীর হাজারো চরিত্র, ছোট বড় ঘটনা, রাজা ঋষি ও তাদের বংশধরদের এই মহাকাব্যকে অনেকটা সহজ ও সাবলীল ভাষায় এ বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। ছোটদের জন্য লিখিত হলেও বড়দের জন্যও এটি উপযুক্ত পাঠ্য বলেই মনে করছি।

চরিত্রের আধিক্য নিঃসন্দেহেই যে কারোর চিন্তায় জট লাগাবে খানিকটা, কিন্তু তাই বলে বইটি শিকেয় তুলে রাখতে পারবেন না পাঠক সমাজ। বইটির কাহিনীবিন্যাস এমন যে পাঠের শুরু থেকেই পাঠক বুঁদ হয়ে থাকবেন পাঠে। লেখকের সার্থকতা এখানেই।

মহাভারতের মূল গল্প কিন্তু কুরুবংশ ও পাণ্ডবদের ঘিরে। পাণ্ডবরা নিজেরাও কুরুবংশের লোক।

আমি এই মহাকাব্যের পর্যালোচনা না করে বরং তিনটি ঘটনার কথা বলি-

এক.

মহাভারতের প্রধানতম চরিত্র ভীষ্ম, যার পিতৃ-মাতৃ প্রদত্ত নাম দেবব্রত। তিনি হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু ও দেবী গঙ্গার পুত্র। পিতা শান্তনু পরবর্তী রাজা হিসেবে তার নামও ঘোষণা করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেবব্রত স্বেচ্ছায় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তার প্রাপ্য অধিকার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং তার বংশধরেরাও যাতে কখনো সিংহাসনের দাবী না করতে পারেন, তাই তিনি জীবনে বিয়ে না করার শপথ নেন। রাজা না হয়েও আমৃত্যু সিংহাসন রক্ষার দায়িত্ব নেন একজন সেবক হিসেবে। তিনি এই শপথ

নেন তার বাবার সুখের জন্য। তার এই শপথের পরেই তার নাম হয় 'ভীষ্ম' আর তার বাবা তাকে এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ইচ্ছামৃত্যুর বর দেন।

পিতার প্রতি ভালবাসা যেমন এখানে অগাধ, ঠিক তেমনি আরেকটা কারণেও এ ঘটনাটি আমার মনে দাগ কেটেছে। তা হলো- নিজের অধিকার অন্যজনকে দিয়ে দেয়ার পর নিজেই দাস হিসেবে সেই অধিকারটুকু রক্ষার দায়িত্ব পালন কী করে সম্ভব! সামান্যতম লোভ ছাড়া!!

দুই.

মহাভারতে অপ্রধান একটি চরিত্র একলব্য। কিন্তু একলব্যের সাথে ঘটিত ঘটনা আমাকে পীড়িত করে। পঞ্চপাণ্ডব এবং ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র যুদ্ধবিদ্যা শিখত গুরু দ্রোণের কাছে। একলব্য দ্রোণের কাছে শিখতে গেলে দ্রোণ তাকে ফিরিয়ে দেন। পরে দ্রোণের মূর্তি তৈরি করে উনাকে গুরু মেনে সে নিজের চেষ্টায় ধনুর্বিদ্যা শিখে নেয় এবং সে ধনুর্বিদ্যায় পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের চেয়েও পারদর্শী ছিল। এটা জানতে পেরে দ্রোণ আশ্চর্য হন কিন্তু গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যের কাছে তার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি চেয়ে বসেন। একলব্যও কোনো দ্বিধা না করে তা কেটে দেন। দ্রোণ এই জঘন্যতম কাজটি করেছিলেন অর্জুনের জন্য। অর্জুন রাজপুত্র, দ্রোণ অর্জুনকে বলেছিলেন সেই হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্বীর। আর রাজপুত্রের সঙ্গে 'সামান্য নিষাদ' বালক অস্ত্রবিদ্যা শিখুক তা দ্রোণ চাননি। তাই তিনি গুরুদক্ষিণার নামে একলব্যের তীর চালানোর শক্তিটুকুই কেড়ে নিলেন।

এ বিষয়টিকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে যদি চিন্তা করি -

আমাদের সমাজের শাসকরা গণতন্ত্রের নামে বংশানুক্রমে তাদের শাসনক্ষমতা বজায় রাখছেন, অন্যকাউকে ধারে কাছে ঘেঁষতে পর্যন্ত দিচ্ছেন না। যেই মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে তাকেই যেন কোনো না কোনো ভাবে স্তিমিত করে দেওয়া হয়, যেন তারই এক দৃষ্টান্ত এ ঘটনা।

তিন.

মহাভারতের অন্যতম প্রধান ঘটনা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। এই দ্রৌপদী হলেন দ্রুপদ রাজার কন্যা, যাজ্ঞসেনী, পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী। মহাভারত সম্পর্কে না জেনেও অনেকেই এ ঘটনাটি শুনে থাকবেন। হস্তিনাপুরে দূতসভায় দুর্যোধনের আমন্ত্রণে রাজা যুধিষ্ঠির যখন পাশা খেলায় একের পর এক হারের পর নিজের রাজ্য, সিংহাসন, চার ভাই এবং নিজেকে হারিয়ে স্ত্রীকে খেলার পণ হিসেবে রাখলেন এবং হেরেও গেলেন। পণ হিসেবে নিজের ভাইদেরকেই বা কিভাবে রাখলেন তিনি! আর স্ত্রীকেই বা কী করে সম্পদ গণ্য করে পণ হিসেবে রাখলেন!! দ্রৌপদীকে হারানোর পর রাজসভায় দুর্যোধনের আদেশে দুঃশাসন তার বস্ত্রহরণে উদ্যত হয়, কিন্তু বস্ত্ররূপে ধর্মদেবতা দ্রৌপদীর শরীর আবৃত করে রাখেন। কিন্তু যেই লাঞ্চনা, অপমান আর অসম্মান সহ্য করতে হয়েছে দ্রৌপদীকে তা চরম অন্যায়।

আমাদের সমাজ আজও নারীর জন্য অনুকূল নয়। আজও আমাদের দ্রৌপদীদের ইভটিজিং হয়, বস্ত্রহরণ হয়, ধর্ষিত হতে হয়...

আসলে মহাভারতের সব ঘটনা যদিও পৌরাণিক, অতি কাল্পনিক তবুও কেমন যেন এসময়ের সাথেও খুব সহজেই মেলানো যায়। লেখকের দাদী যথার্থই বলেছেন 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে'।

আরো কিছু তথ্য

রোকেয়া নাসরিন

'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে' লেখকের দিদিমার কথাটা অবান্তর নয়। ধর্ম, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস সবই রয়েছে এই বৃহত্তম মহাকাব্যে। এটি কোন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ নয়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একে গল্পগ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করেছেন। লেখকের সরল ভঙ্গিমার লেখায় কাহিনি যেন জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। কিছু কিছু জায়গায় তিনি সমালোচকের মতো যুক্তি ও সম্ভাব্যতা ব্যক্ত করেছেন এবং স্বীকারোক্তি সমেত কিছু ঘটনা বাদ দিয়েছেন যা একটু ভাববার অবকাশ দেয়।

পৌরাণিক কাহিনীতে দেব-দেবীদের উপস্থিতির পাশাপাশি একটা বিষয় বিস্ময় সৃষ্টি করে, সেটা হলো- আশীর্বাদ, অভিশাপ, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও ফলে যাওয়া। এগুলোই যেন পূর্বাপর ঘটনার সমন্বয় সাধন করে। মহাভারত পড়তে গিয়ে কপট পাশা খেলা, খাণ্ডবদাহন, অভিমন্যু হত্যা.. এমন কিছু ঘটনায় একটু আহত বোধ করেছি। আর শেষটুকু সুনীল লিখলে হয়তো আরেকটু সাবলীল হতো। বইটি পড়তে গিয়ে কিছু জিনিস নিজের আগ্রহে জেনে নিয়েছি। সেগুলো হলো-

- রাজা বিচিত্রবীর্য মারা গেলে বংশ রক্ষার্থে রাজামাতা সত্যবতী তার কানীনপুত্র বেদব্যাসকে অনুরোধ করেন নিয়োগ প্রথানুসারে ভাতৃবধূদের গর্ভে সন্তান প্রদানের জন্য। তার ঔরসেই অম্বিকা; অম্বালিকা এবং এক দাসীর গর্ভে জন্ম হয় যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিধুরের।
- অশ্বীনিকুমার-বিশ্বকর্মার মেয়ে সঙ্গার সাথে সূর্যের বিয়ে হলে সে সূর্যের তাপ সহ্য করতে না পেরে শরীর থেকে ছায়া নামের একটি অংশ রেখে পিতৃগৃহে ফিরে আসে, পিতা স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বললে সে অশ্বিনী রূপে উত্তর কুরুবর্তে যায় তখন সূর্য অশ্ব রূপে তার সাথে মিলিত হলে জন্ম হয় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের।

- যম-ই হলেন ধর্মরাজ। যুধিষ্ঠির; অষ্টবসু তার ছেলে।
- দাড়ি-গোঁফ ছিল না বলে ভীমকে কর্ণ ঠাট্টা করে মাকন্দ ডাকত। তার ছেলের মাথা হাতির মতো কেশশূন্য ছিলো বলে নাম হয় ঘটোৎকচ।
- যুযুৎসু-দাসীর গর্ভে জন্মানো ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; তার এই পুত্রই একমাত্র জীবিত ছিল এবং যুদ্ধে সে পাণ্ডব পক্ষে ছিল।
- গান্ধারীর অভিশাপে যদুবংশ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয় ও কৃষ্ণ ব্যাধের হাতে মৃত্যুবরণ করেন।
- গন্ধর্ব-স্বর্গীয় গায়ক; নিম্নশ্রেণির দেবতা। সূর্যের রথ চালনা করতেন। এদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ছিল, তাই ছেলে মেয়ের অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে যে বিবাহ প্রথা তাকে গন্ধর্ব বিবাহ বলে।
- কুন্তি কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের বোন ও রাজা কুন্তিভোজের পালিত কন্যা।

চরিত্রের হুটোপুটি

সুলতানা ইয়াসমিন

পঞ্চপাণ্ডবের খণ্ড খণ্ড গল্প বিভিন্ন সময়ে পড়া হয়েছে। পুরো গল্পটা আগে কখনো পড়া হয়নি। এখন পড়ার পর ঠিক বুঝতেও পারছি না যে আসলে না পড়লে ঠিক কতটুকু ক্ষতি হতো! বয়স আরো অল্প থাকতে থাকতেই যদি পড়তাম তাহলে বোধহয় আরো কিছু রস আস্বাদন করা যেতো। এজন্যই হয়তো মহাভারতের বাংলা সংস্করণগুলো ছোটদের উপযোগী করে লিখার প্রবণতা বেশি চোখে পড়ে।

এত এত চরিত্রের হুটোপুটি আর এত এত জ্ঞাতিত্বের জঞ্জাল! মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছিলো রীতিমতো। এত বেশি অলৌকিকতা আর এত বেশি অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ যে, কোনো কিছুকেই প্রশ্ন বা চ্যালেঞ্জ তো করা যাচ্ছেই না, সমালোচনাও করা যাচ্ছে না। লেখক (সুনীল) মহাশয় অবশ্য মাঝে মাঝেই কিছু সমালোচনা বা প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছেন, অনেকটা রোম্যান্টিক আয়রনির মতো করেই। কিন্তু সেই প্রশ্নগুলোর ধরন দেখে মনে হচ্ছিলো এর আগে পর্যন্ত বোধহয় সব ঠিকঠাকই ছিল!

দেবতারা হলেন সর্বোচ্চ শক্তিমান সত্তা। তাদের কাছে মানুষের শক্তি খুবই তুচ্ছ। আবার কিছু মানুষকে দেবতারা হারাতে পারেন না। আবার বলা হচ্ছে মানুষও এক সময় দেবতা হতে পারে। ঋষিরা আবার দেবতাদের চেয়েও ক্ষমতাধর। দেবতারা বিপদে পড়ে ঋষিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্বর্গের দেবতারা মর্ত্যে এসে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে মনুষ্য কোন্দলেও জড়ান। মর্ত্যের মানুষও কিছু সময়ের জন্য স্বর্গে গিয়ে বেড়িয়ে আসতে পারেন। দেবতারা তো হরহামেশা নানা রকম বর দিচ্ছেনই, মানুষরাও কী অবিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য বর দিচ্ছে মানুষকে।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস তাঁর সর্বোচ্চ কল্পনাশক্তিটুকুর ব্যবহার করেছেন মহাভারত রচনায়। পাঠক হিসেবে তাঁর এই অবিশ্বাস্য কল্পনাপ্রসূত কিচ্ছাকাহিনী যদি আপনি হজম করতে না পারেন, সে নিতান্তই আপনার কল্পনাশক্তির দীনতা। নিজের এই দীনতাকে হজম করে, সহজ বাংলায় মহাভারত মহাকাব্যের কাহিনী জানতে চাইলে 'আমাদের মহাভারত' একটি দারুণ সুন্দর বই।

মহাভারতের শিক্ষা

প্রার্থী ঘোষ

কুরুবংশীয় রাজা জনমেজয়ের পূর্বপুরুষ কুরুরাজ্যের রাজধানী হস্তিনাপুরের মহারাজ শান্তনুর সময় থেকে মহাভারতের মূল কাহিনী শুরু হয়। শান্তনু গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন ও পরপর সাত সন্তানের মৃত্যুর পর তাদের অষ্টম সন্তান দেবব্রত (ভীষ্ম) জন্মালে গঙ্গা অন্তর্হিত হন। মহারাজ শান্তনুর দ্বিতীয় বিয়েতে চুক্তিস্বরূপ পুত্র দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি কখনো সিংহাসনে বসবেন না এমনকি চিরকুমার থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য তিনি 'ভীষ্ম' নামে খ্যাত হন ও ইচ্ছামৃত্যুর বর লাভ করেন।

মহাভারতের পুরো ঘটনা কৌরব আর পাণ্ডব ভাইদের পারিবারিক দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ নিয়ে। যদিও কৌরব আর পাণ্ডব ভাইয়েরা একই বংশের। তবুও সিংহাসন লাভের বাসনা থেকেই তাদের এই আলাদা বংশে ভাগ হয়ে যাওয়া এবং সবশেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কুরুক্ষেত্র বিশাল এক ময়দানের নাম, যেখানে কৌরব ও পাণ্ডব ভ্রাতৃগণ, আত্মজগণ এবং তাদের পক্ষের লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চক্রব্যুহ নামে এক শক্তিশালী ব্যুহ সর্বপ্রথম এই যুদ্ধে কৌরবরা তৈরি করে পাণ্ডবদের হারাতে। চক্রব্যুহ একটি গোলাকার বিশাল প্যাঁচানো ব্যুহ, যে ব্যুহে ঢুকতে ও বেরুতে আলাদা নিয়মাদি থাকে। সাধারণ যোদ্ধাদের পক্ষে সেখানে প্রবেশ ও বের হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

পাণ্ডব ভাইয়েদের মা কুন্তি ও বাবা পাণ্ডু। পাণ্ডুর ছেলেদের পাণ্ডব বলা হয়। পাণ্ডবদের বড় ভাই যুধিষ্ঠির। যথাক্রমে অন্য চারজন হলেন- ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। পাঁচভাইয়ের স্ত্রী দ্রৌপদী।

কৌরব ভাইয়েদের মা গান্ধারী ও বাবা ধৃতরাষ্ট্র। ব্যসদেবের সাধনা করে গান্ধারী শত পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তানের জননী হন। দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুঃসহ, বিকর্ণ প্রভৃতি শতপুত্র। কন্যাটির নাম দুঃশলা। এরাই কৌরববংশ।

জন্মমাত্রই দুর্যোধন গাধার ন্যায় চিৎকার করেছিলেন এবং নানা অমঙ্গলের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল। বিদুর ও ব্রাহ্মণগণ তখন দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে বলেছিলেন। কিন্তু পুত্রস্নেহের জন্য ধৃতরাষ্ট্র তা করতে পারেননি।

ধৃতরাষ্ট্র যেমনি জন্মান্ধ ছিলেন তেমন পুত্রস্নেহেও অন্ধ ছিলেন। কিন্তু সেদিক থেকে গান্ধারী ছিলেন সবসময় ন্যায়বোধে অটল। দ্রৌপদীর অপমানসহ বিভিন্ন সময় পঞ্চ পাণ্ডবের সাথে হওয়া অবিচারের তিনি প্রতিবাদ করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বকালে দুর্যোধন যখন তার মায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে আসত তখন টানা যুদ্ধেও আঠারো দিন গান্ধারী শুধু একটি বাক্যই বলতেন - 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' অর্থাৎ 'ধর্ম যেখানে জয় সেখানে'।

আঠারো দিন পর গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের মৃত্যু হলে ক্রুদ্ধ গান্ধারীকে কৃষ্ণ সান্ত্বনা দেয়ার সময় বলেন তার আশীর্বাদ সফল হয়েছে। এতে সাময়িক শান্ত হন তিনি।

মহাভারতের ঘটনাবলীতে পৌরাণিক-অলৌকিক বিভিন্ন ঘটনার (যেমন: অলৌকিকভাবে জন্মলাভ, বর দেওয়া-পাওয়া, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতি) পাশাপাশি পারিবারিক দ্বন্দ্ব রাজনীতিও জড়িয়ে আছে। গল্পকার সৌতি গল্পের কতটুক আসল কিংবা কতটুক নিজ থেকে বলেছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। গল্প কথক যেহেতু শুধু সৌতি, তাই তার কথা আমরা না মেনে উপায় কী!

প্রত্যেক কাব্য, গল্প, বই যা-ই পড়ি না কেন, পড়া শেষে মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই ঘুরপাক খায়। কিছু বিষয় থাকে অমীমাংসিত। তবে প্রতিটি পাঠেই কোনো না কোনো শিক্ষা থাকে। তেমনি মহাভারতের প্রত্যেকটি ঘটনা থেকেই নিশ্চিতভাবে কিছু না কিছু শিক্ষা নেওয়া যায়। যেমন ধরুন-

- যুদ্ধ-সংঘাত নিয়েই জীবনে টিকে থাকতে হবে। জীবনে সততার সাথে টিকে থাকার যুদ্ধ চালিয়ে গেলে সুন্দর ফলাফল লাভ হবেই। যেমন, তেরো বছর বনবাসের পর কৌরব-পাণ্ডব ভ্রাতাদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।
- ক্রোধ সংযম করা অতীব দরকার। ক্রোধের বশেই অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে জীবনে হেরে যেতে হয়। যেমনটা যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলায় হারতে হারতে একপর্যায়ে সর্বস্ব হারিয়েও এক প্রকার আত্মক্রোধ থেকেই পাণ্ডবদের বারো বছর বনবাসের সাথে এক বছর অজ্ঞাতবাস করে কাটাতে হয়েছিল।

- আত্মবিশ্বাস থাকলে যেকোনো কাজে অর্ধেক সাফল্য আপনা-আপনিই এসে যায়। যেমনটা পাণ্ডবদের জীবনীতে পাই। আরো একটি উদাহরণ হচ্ছে অন্ধ হয়েও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য চালানো।
- পরনির্ভরশীলতা কমালেই নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের দানা বাঁধতে থাকে। বলতেই হয়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধন পরনির্ভরশীল ছিল । যার অনিবার্য পরিণতি তার পরাজয়।
- গুরুজনে শ্রদ্ধাভক্তি, মাতৃভক্তি... এই বিষয়গুলো মহাভারতের গল্পে আমাদের চোখে পড়েছে খুব করে। যেমনটা মায়ের আদেশে ভীমের রাক্ষসের সাথে পাহাড়ের চূড়ায় যুদ্ধ করতে যাওয়া, কিংবা রাক্ষস হিড়িম্বার বোন হিড়িম্বিকে বিয়ে করা। আবার বড় ভাই যুধিষ্ঠির অর্জুনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভাতৃপ্রীতি চিত্তাকর্ষক অবশ্যই।

মহাভারতের বিশাল পটভূমিতে কিছু অন্যায় ঘটনা চোখে পড়ে- ধৃতরাষ্ট্র ছেলেদের শাসন না করায় শেষে গিয়ে দুর্যোধনের মা-বাবার আদেশ অমান্য করা, কর্ণকে কুন্তীর ছেলের জায়গা থেকে বঞ্চিত করা, অস্ত্রগুরু দ্রোণ শিষ্য একলব্যের প্রতি অন্যায় স্বরূপ বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে নেওয়া, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিয়ম ভেঙেই ভীম দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করা, যুধিষ্ঠির কর্তৃক 'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যে বলে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া এসব ছাড়াও আরো অনেক ঘটনা আছে যা নৈতিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

মর্ত্যলোকের সাথে স্বর্গের যাওয়া-আসার পথ থাকা, স্বর্গের দেবতাগণ মর্ত্যলোকের ক্ষত্রিয়কুলের কাছে হেরে যাওয়া, অনেক অনিষ্ট সাধন করেও দুর্যোধনের স্বর্গলাভ, যুধিষ্ঠির বাদে পাণ্ডব ভ্রাতাদের নরক লাভ... এইসব প্রশ্ন পৌরাণিক কাহিনী রূপেই রাখা যায়।

মহাভারত মূলত একটি মহাকাব্য। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মুখসৃত বাণীগুলোই পুস্তক আকারে গীতা। গীতা হিন্দুধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। কথিত আছে 'গীতা পড়ে গীতা শুনে জীব মুক্ত হয়'। পাঠের জন্য বই হিসেবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমাদের মহাভারত' ভালো একটি নির্বাচন। ডাউস সাইজ আর অসংখ্য চরিত্রের জটিলতা সত্ত্বেও এক বসাতেই মুগ্ধচিত্তে পড়ে শেষ করে ফেলা যায়।

প্রশ্ন তোলা যায়?

সোহান আল মাফি

স্যাটেলাইট টেলিভিশনের কল্যাণে মহাভারতের বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা আর কিছু চরিত্রের নাম জানা থাকলেও পুরো ঘটনা অজানাই ছিল এতদিন। আবার তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিবারই জট পাকিয়ে ফেলতাম। এত এত চরিত্র, এক চরিত্রের একাধিক নাম, সম্পর্কের বৈচিত্র্যতার জন্য জট পাকিয়ে যাওয়া বা গল্পের মাঝে খেই হারিয়ে ফেলা এখানে একদম স্বাভাবিক।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শিশুদের কথা চিন্তা করে অনেক চরিত্র ও গল্প গভীরভাবে তুলে ধরেননি। শুধুমাত্র মুখ্য চরিত্র ও মূল ঘটনাগুলোই তুলে ধরেছেন। তবুও দু-একবার খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো পাতার পর পাতা উল্টে গিয়েছি অবাক বিস্ময়ে। এর জন্য মহাভারতের রোমাঞ্চকর কাহিনীর যতটা ভূমিকা ঠিক ততটাই ভূমিকা সুনীলের গতিময় বর্ণনার। সুনীল গত হওয়ার পর গল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। যেন এক প্রকার জোর করেই শেষ করা হয়েছে।*

তখনকার সময়ে নাটকীয়তা বাড়ানোর জন্য গল্পে আলৌকিকতা অনেক বেশি প্রচলিত ছিল। আবার অনেক বিষয় বাড়িয়ে বলা হত। যেমন: বয়স, সময়কাল, সংখ্যা প্রভৃতি। লেখক এ বিষয়গুলো নিয়ে নিজেও প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু এত বেশি আলৌকিকতার ভীড়ে গল্পের মাধুর্য যেন একটুও ম্লান হয়নি।

সে সময় গল্প লিখে রাখা হত না। গল্পগুলো সৌতিদের মাধ্যমে লোকমুখে প্রচলিত হত। সৌতিরা অনেক সময় অনেক বিষয় বলতে ভুলেই যেতেন। যেমন: অর্জুন দ্রৌপদীকে জয় করার সময় কিসে লক্ষ্যভেদ করেছিলেন তা বলতে ভুলে যান। এ নিয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে। এমন একটা নয়, অনেকগুলো

ঘটনার কথাই লেখক বলেছেন। এতে মহাভারতের মূল ঘটনা কতটা বিকৃত হয়েছে সেটা কে-ই বা বলতে পারবে । আবার অনুবাদকের ভুলেও কাহিনী বিকৃত হয়ে থাকতে পারে। তাহলে কি মহাভারতের অবিকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়? আবার এমনও হতে পারে বিকৃত হয়েছে বলেই কাহিনী দিন দিন আরও বেশি রোমাঞ্চকর হয়েছে!

সব কিছুর উর্ধ্বে মহাভারত রচনায় বেদব্যাসের প্রখর কল্পনা শক্তি, তার অধ্যবসায়, মেধা ও শ্রম। বিকৃতি হোক বা না হোক এমন মহাকাব্য রচনার ক্ষমতা খুব কম মানুষের ছিল বা আছে।

*** ছোটদের জন্য সহজ ভাষায় লেখা সুনীলের মহাভারতের বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল আনন্দমেলা পত্রিকায়। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে তা থমকে যায়। তারপর আনন্দমেলা পত্রিকা বাকি সামান্য অংশের কাহিনী সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে। এ বইতেও সেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।*

কার ক্ষমতা বেশি?

সানজিদা আক্তার তানিয়া

মহাভারত শব্দটার সাথে পরিচয় সম্ভবত প্রাইমারিতে। একটা খেলা ছিল একটানে লিখা। আমরা একে অন্যকে বলতাম, 'একটানে মহাভারত লিখে দেখাতো দেখি।'

এরপর আরো একটু বড় হয়ে স্টার জলসার বদৌলতে অন্য এক মহাভারত চিনলাম এবং কয়েকটা চরিত্রের নাম জানলাম। কিন্তু এ সম্পর্কে কখনো পড়িনি কিংবা কাহিনীও পুরোপুরি জানা হয়নি। আজ এতো বছর পর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই পড়ে জানলাম আসল মহাভারত সম্পর্কে। মনে হলো- আচ্ছা এই মহাভারত তো সে একটানের মহাভারত নয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম আলো বইটা পড়ার পর থেকেই আমি উনার বইয়ের ভক্ত। উনি এতো সুন্দরভাবে সবকিছুর বর্ণনা দেন যে সবার ভালো লাগতে বাধ্য। ছোটদের পাঠ উপযোগী করে মহাভারতের কাহিনীগুলোকে দারুণভাবে তুলে ধরেন তিনি এই বইয়ে।

মহাভারত নিয়ে কী লিখব, আমি খুব দ্বিধা দ্বন্দ্বে আছি। তবে আমি এককথায় স্বীকার করি যে মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাসের কল্পনাশক্তি সত্যিই অতুলনীয়। তিনি কল্পনাশক্তি দিয়ে দারুণভাবে রাজা, রাক্ষস, বীর, দেবতা সবার সাথে সবার যুদ্ধ বাঁধিয়ে, বর-অভিশাপ দিয়ে নাকাল করে ছেড়েছেন। মহাবীর অর্জুনকে একবছর মেয়ে পর্যন্ত সাজিয়ে রেখেছেন। লেখকদের এই বিষয়টাই আমার কাছে চমৎকার লাগে। তারা স্বাধীনভাবে কী সুন্দর একটার পর একটা কাহিনী সাজাতে পারে। ছোটবেলায় অনেক রাক্ষস-খোক্কস আর রূপকথার গল্প শুনতাম। এইদিক থেকে মনে হলো আসলে তখনকার গল্পগুলো এমনই ছিলো।

মহাভারতের অনেক কাহিনীর আলৌকিকতা আর পরাবাস্তবতার দিকটা বাদ দিলে, এককথায়- আমি বইটি পড়তে আনন্দ পেয়েছি এবং এক বসায় পড়েছি। অসুর, দেবতা, রাজা, যুদ্ধ, কূটনীতি, প্রেম, ভালোবাসা, ত্যাগ কোনোকিছুরই ঘাটতি নেই এতে। এমনকি গীতার বাণীগুলোও মহাভারত থেকে এসেছে। এইদিক থেকে লেখকের দাদির মতো বলাই যায় 'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে'। মহাভারতে এতো এতো চরিত্র আছে যে অল্পকয়জন ছাড়া আমি প্রায় অনেকের নামই ভুলে গেছি।

তবে বইটিতে নায়ক হিসেবে পঞ্চপাণ্ডব কে তুলে ধরলেও ভীষ্ম, কর্ণ, একলব্য, অসুর শুক্রাচার্যকেই আমার বেশি ভালো লেগেছে। মহাভারতে আমরা দেখি, যে মানুষগুলো ভালো তারা একটু বেশিই ভালো, উদার আর অনুগত। যার উদাহরণ- পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীকে বিয়ে করা, ভীষ্ম আর একলব্যের আত্মত্যাগ ইত্যাদি।

মহাভারত পড়ে আমার আরো একটা বিষয়ে কৌতুহল জাগলো- দেবতা, অসুর, ঋষি বলতে প্রকৃত অর্থে কী বুঝায় আর এদের মধ্যে কার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি?

প্রিয় চরিত্র কর্ণ

ফাতেমা জাফর প্রিয়া

বিশ্বের অন্যান্য মহাকাব্যের মধ্যে মহাভারতই সবচেয়ে দীর্ঘ, এখানে বহু চরিত্র ও গল্পের সন্নিবেশ ঘটেছে। এই দীর্ঘ মহাকাব্যকে শিশু কিশোরদের জন্য সহজ সাবলীল ও পাঠ উপযোগী করে তুলেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

ধর্মীয় প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে হলেও এখানে, রাজনীতি, প্রেম, যুদ্ধের কলাকৌশল, কূটচাল, ক্ষমতার লড়াই, সত্যের সংগ্রাম, অন্যায্য আবেগ-অহংকারের পরিণতি, কৃতজ্ঞতা ও নৈতিকতা সহ বিভিন্ন জীবনদর্শন গল্পচ্ছলে সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রতিটি চরিত্র নিজ নিজ দোষেগুণে সজ্জিত ছিল। যেমন, যুধিষ্ঠির জ্ঞানী হলেও রাজা হিসেবে ব্যর্থ ছিল, দুর্যোধন লোভী কিন্তু সাহসী ছিল, শকুনি কূটিল কিন্তু নিজ দলের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত ছিল, ভীষ্ম ত্যাগের প্রতীক ছিল কিন্তু শেষে এসে অম্বা ও কর্ণের প্রতি অন্যায়-বৈষম্য প্রকাশ পেয়েই যায়। অন্যরা না জেনেই কর্ণকে অবহেলা করত অথচ ভীষ্ম সব জেনে শুনেও কর্ণকে পছন্দ করত না। ধর্মের পক্ষে থেকেও কৃষ্ণ কিন্তু ঠিকই ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল।

আমার প্রিয় চরিত্র একজনই ছিল... মহাবীর কর্ণ। মহাভারতে অর্জুনের জয়গান শুনলেও আমার কর্ণের প্রতি শুরু থেকেই একটা সহানুভূতি কাজ করতো, বইটি পড়ে তা আরো দৃঢ় হয়। কিছু মানুষের জন্মই হয় যেন ঠিক অবহেলা পাবার জন্য, কর্ণ তেমনই একজন। জন্মের পর থেকে মৃত্যু অবধি শুধু অবহেলা ও প্রতারণার শিকারই হয়েছিল সে। অথচ, শত অভিমান মনে নিয়েও সব সময় সে নিজের নৈতিকতায় দৃঢ় ছিল। কর্ণের প্রতিটি কথোপকথন, বিশেষ করে কৃষ্ণ-কর্ণের কথোপকথন যেন মুগ্ধ হয়ে পড়েছি। শুধু কর্ণ চরিত্র নিয়ে যদি কোনো উপন্যাস থাকে তা পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করছি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বইটিতে প্রবল এক আকর্ষণ তৈরি করে রাখেন, যার টানে পাঠক বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা এগিয়ে যেতে থাকে আর কল্পনায় প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনাই যেন দেখতে পায়। যদিও বেশ কিছু বিষয় বইটিতে আসেনি বলে একটু হতাশ হয়েছি, তবুও বইটি সুখপাঠ্য।

অবশ্যপাঠ্য বই

অনন্যা বড়ুয়া

কোরআন, গীতা, বাইবেল ছাড়াও পৃথিবীর আরো চারটি বিখ্যাত বই হলো- রামায়ন, মহাভারত, ইলিয়াড ও ওডিসি। এর মধ্যে মহাভারতই সবচেয়ে বড়।

মহাভারতের কাহিনি এর আগেও অনেকবার শুনেছি বা টিভিতে দেখেছি কিন্তু কোনবারই পুরোপুরিভাবে জানা হয়নি। ছোটবড় অনেক কাহিনি রয়েছে মহাভারতে কিন্তু প্রতিটি কাহিনি একেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মহাভারতে যুদ্ধকৌশল, কুটনীতি, সত্যের সংগ্রাম, সিদ্ধান্তগ্রহণ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, প্রেম-হিংসা, নৈতিকতা, বিচার, আবেগ, অল্প জ্ঞানের ফলাফল, নিষ্ঠা ও মনের জোর, স্থিরলক্ষ্য, প্রতিশোধ, সমাজ ও ধর্ম সহ অন্যান্য বিষয় খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অসংখ্য চরিত্রের মহাভারতে প্রতিটি চরিত্রই একেকটি গল্প। সকল চরিত্রের মধ্যে মূল চরিত্রগুলো নিয়ে বললেও পাঠ প্রতিক্রিয়ার কলেবর অনেক বড় হয়ে যাবে।

খাণ্ডবদাহন, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, অগস্ত্যযাত্রা, এমন অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করলেও মহাভারত পাঠে তার ব্যাখ্যা পেলাম। এমনকি হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ গীতা কিভাবে এসেছে তাও জানলাম। আরো জেনেছি সংখ্যা মুখস্তের ছড়া যা সত্যি চমৎকার।

মহাভারতে কিছু ঘটনায় যদিও অতিরঞ্জন, অনৈতিকতা, অবিচার প্রভৃতি রয়েছে তবুও অনেকে বলেন, মহাভারতের কাহিনি অমৃতকথা এবং চিরন্তন সত্য।

মহাভারতের মতো মহাকাব্যকে সংক্ষিপ্ত করে লেখা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'মহাভারত' এতো বিশাল হওয়ার পরেও লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মূল মহাভারতকে ঠিক রেখে খুব সহজ, সুন্দর, গোছালো ও সংক্ষিপ্ত আকারে তা প্রকাশ করেছেন। মহাভারতের ইতিহাস সংক্ষেপে জানতে হলে অবশ্যপাঠ্য বই 'আমাদের মহাভারত'।

খটকা!

শাকিল আহমেদ

'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে'- বহুল প্রচলিত এ প্রবাদটি দ্বারা বুঝানো হয় ভূ-ভারতে যা কিছু আছে তার সবই মহাভারতের গল্পে রয়েছে। অতিপ্রাকৃতিক নানা ঘটনার বর্ণনা রয়েছে মহাভারতে। তার সাথে রয়েছে অনেক রাজা-মহারাজার রাজত্বের বিবরণ। তবে মহাভারতের মূল চরিত্রগুলো হলো কৌরব আর পাণ্ডব বংশের। পাণ্ডবরাও কৌরবদের একই বংশের কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা কৌরবদের থেকে আলাদা হয়ে যায়।

মহাভারতের বিশাল কাহিনিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাস 'আমাদের মহাভারত'-এ বাচ্চাদের গল্প শোনানোর ছলে তুলে ধরেছেন। মহাভারতের সামনের সারির কিছু চরিত্র হলো কৃষ্ণ, দেবব্রত (ভীষ্ম), যুধিষ্ঠির, দুঃশাসন, কর্ণ, দুর্যোধন, কুন্তি, গান্ধারী, অর্জুন, ভীম, সহদেব ইত্যাদি অনেক চরিত্র রয়েছে। মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন দেবতা ও অসুরও রয়েছে।

মহাভারতে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। প্রায় আঠারো দিন স্থায়ী হয় এই যুদ্ধ। অনেক রথী-মহারথী মৃত্যুবরণ করে এই যুদ্ধে। এটিকে মূলত ধর্মযুদ্ধ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকলেই জানতো পাণ্ডবরা ধর্ম আর ন্যায়নীতির পক্ষে এবং কৌরবরা বিপক্ষে। তারপরও কৌরবদের পক্ষে বড় বড় বীরেরা লড়াই করে নিহত হয়েছেন। জেনেশুনে কেন তারা অধর্মের পক্ষে লড়াই করলো, বইটি পড়ার সময় এখানে একটু খটকা লেগেছে।

পুরো গল্প জুড়েই খটকা লাগার মতো আরো অনেক ঘটনা রয়েছে। তবে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি অবাক লেগেছে গল্পের শেষে গিয়ে ধর্মের পক্ষের যুধিষ্ঠির ব্যতীত বাকি সবাই প্রথমে নরকে গেছে, আর অধর্মের ধ্বজাধারী দুর্যোধনের জায়গা হয়েছে স্বর্গে!

যদি সত্যি হতো!

জান্নাতুল ফেরদৌস সাকী

মহাভারত পাঠের অভিজ্ঞতা আমার শৈশবের শেষের দিকে। প্রতিবেশী এক ভাইয়ার পড়ার টেবিলে পেয়েছিলাম। নাম ছিল 'ছেলেদের মহাভারত', লেখক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। আমার জন্য তখন বইটা বেশ বড় ছিল। শ্রেণিপাঠ্যের বাইরের বই সে সময় লুকিয়ে পড়তে হতো। প্রথম পাঠে বেশ মজা পেয়েছিলাম, ভয়ও পেয়েছিলাম ওখানকার অলৌকিক কাহিনী পড়ে।

পুরোটা পড়েছিলাম কিনা মনে নেই। ওখানে বোধ হয় আরো কিছু বিষয় ছিল, যা এই বইয়ে পাইনি। 'আমাদের মহাভারত' কিশোরদের জন্য লেখা। আমিও পড়ার সময় কিশোরী বনে গিয়েছিলাম বইকি। লেখক মাঝে মাঝে কিছু গল্প সংক্ষেপ করলেন বা বললেন যে এটা নিয়ে গোটা একটা বই আছে, ইচ্ছে হলো তখনই সে সব পড়ে নিই। এই বয়সে একবারও 'মহাভারত' নিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা কেন করি নাই, ভেবে আফসোস হলো খুব।

মহাভারত তো রূপকথার গল্প, পৌরাণিক কাহিনী। তবু এই যে বর-অভিশাপ খেলাটা পড়ে মনে হলো, আহ! যদি তা সত্যি হতো! কিন্তু রূপকথা তো রূপকথাই।

সেকালের সমাজে নারী পুরুষের ভূমিকা কেমন ছিল, মর্যাদা কেমন ছিল, তার প্রভাব মহাভারতে স্পষ্ট। গল্পের ভেতরের চরিত্রগুলোর বিচিত্র নামকরণ আমার বেশ ভালো লেগেছে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে বাঙলা ভাষায় কত যে উপমা আছে তার কিছুটা হলেও ধারণা হলো। যেমন 'অগস্ত্য যাত্রা'। সর্বোপরি, লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পবলার ধরনে এতই আকৃষ্ট হয়েছি যে, বইটা ধরার পর থেকে জরুরী কাজ ছাড়া অন্য কিছুতেই আমি আমার মনোযোগ ফেরাইনি।

গল্পে গল্পে ইতিহাস

শাহীনুর আক্তার

আমার কাছে মনে হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীর বিশেষত্ব হলো তিনি ইতিহাসকেও খুব সুন্দর করে গল্পের মতো উপস্থাপন করতে পারেন। যার ফলে তার বেশি পৃষ্ঠার ইতিহাসের বইগুলো পড়তে একঘেয়েমি লাগার কোনো সুযোগ থাকে না। মূল মহাভারতের কাহিনী বিস্তর হলেও লেখক এই বইয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে খুব সহজ কিন্তু সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের মতো করে। কিছু কিছু জায়গায় রূপকথার গল্পের মতো তুলনা করে ঘটনার অযৌক্তিকতা প্রকাশ করেছেন লেখক, এটা ভালো লেগেছে। উদাহরণ হিসেবে রাজাদের হাজার হাজার বছর আয়ু পাওয়া, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের ১০১ টি সন্তান হওয়া এবং জীবিত মানুষের কিছুদিন স্বর্গ থেকে ঘুরে আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসার কথা বলা যেতে পারে। এ সম্পর্কে লেখক বলেছেন 'স্বর্গ বোধহয় কাছাকাছি কোথাও ছিলো'।

এছাড়াও আরো এরকম অসংখ্য ঘটনার অযৌক্তিকতা নিজে মূল্যায়ন করে নিজস্ব মতামতে সমাধান দিয়েছেন। পড়তে পড়তে কিছু কিছু জায়গায় গুলিয়ে ফেলেছিলাম কে কার ছেলে, কোন রাজা। বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্ন না তুলে এককথায় বলতে গেলে- মহাভারতের মূল কাহিনী জানার জন্য এটা একটা অসাধারণ বই।

পাঠকের আপসোস

লুৎফা আকন্দ

বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ছোটদের জন্য লেখা এই গল্পেও তিনি রেখে গেছেন অসাধারণ লিখনশৈলী। গল্প শুরুর ভূমিকাকেও গল্পের সুরে এতো সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন যে, গল্প পড়ার আকর্ষণ পাঠক শুরু থেকেই পায়।

সুনীল শুরুতেই বলেছিলেন মহাভারত হলো বটবৃক্ষের মতো। বইটা পড়তে পড়তে এই ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে টের পাই। বটবৃক্ষের মতো এই মহাকাব্যের এতো ডালপালা যে কিছুক্ষণ পরপরই খেই হারিয়ে ফেলেছি।

তবে ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত হয়েছি বেশ। মহাভারতের অনেক চরিত্র সম্পর্কে বা বেশ কিছু গল্প ছাড়া ছাড়াভাবে জানতাম। সেগুলোর অধিকাংশই এই বই পড়াতে স্পষ্ট হয়েছে।

"গল্পের এই জায়গাটা আমার মতো অনেকেরই পছন্দ হয় না" সুনীল অগ্নিদেবের বন ভক্ষণের ঘটনাটা নির্দেশ করে কথাটি বলেছেন। সেই হিসেবে আমার নিজস্ব মতামত বলতে গেলে দ্রৌপদীর বিয়ের ঘটনাও আমার ঠিক পছন্দ হয়নি। যার স্বয়ম্বর সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে তার বিয়ে নিয়ে এমন দোলাচাল পছন্দ না হওয়ারই মতো।

একলব্যের প্রতি দ্রোণের ব্যবহারে বড় বেশি নিষ্ঠুরতা ছিল, আর কর্ণকে হতভাগ্য মনে হয়েছে। জেনে-বুঝে যেনো সবাই মিলে তার এরূপ হতভাগ্য জীবন সৃষ্টি করেছে।

সুনীলের যে অসাধারণ লিখনশৈলীর সাথে পরিচয় হয় গোটা লিখায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে তা রীতিমতো হোঁচট খায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অসম্পূর্ণ এই বইটির শেষ ভাগ আমাকে বারবার সুনীলকে মনে করিয়েছে। মনে হচ্ছিলো সুনীল লিখলে ঘটনাপ্রবাহ আরো কতটা সুন্দরভাবে সমাপ্ত করতে পারতেন। পুরো বইয়ে এই একটা আপসোস থেকেই গেল।

সত্যবাদী যুধিষ্ঠির

নাইমা সুলতানা

লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করেছেন 'আমাদের মহাভারত' বইয়ে। লেখক যদিও গল্পকথক হিসেবে ছোটদের জন্য মহাভারতের ঘটনা গল্পের ঢঙে বলছেন কিন্তু যেকোনো বয়সের মানুষ 'আমাদের মহাভারত' খুব আগ্রহের সাথে পড়বে। আমি বইটি পড়ছিলাম আর মনে হচ্ছিল আমি যেন কারো মুখে মহাভারতের ঘটনাটা শুনছি।

'মহাভারত' ঋষি বেদব্যাস রচিত বিখ্যাত মহাকাব্য। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহাকাব্যের একটি। শতশত চরিত্র ও তাদের কাহিনী-উপকাহিনী নিয়ে রচিত এই অসাধারণ পৌরাণিক কথা। কী নেই এ গল্পে? সমাজ, ধর্ম, নীতি, প্রেম, হিংসা, ক্ষমতার লড়াই, সত্যের সংগ্রাম ...

তাইতো লেখকের দিদিমা বলতেন- 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে'। বইপ্রেমী হোক আর গল্পপ্রেমী হোক, বলা যায় মহাভারত সবার জন্যই সুপাঠ্য!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'আমাদের মহাভারত' বইটিতে মহাভারতের মূল কাহিনীটা সবার সামনে আনার চেষ্টা করেছেন। মহাভারতের মূল উপজীব্য বিষয় হল কৌরব ও পাণ্ডবদের গৃহবিবাদ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনাবলী।

ব্যক্তিগতভাবে আমার বেশ ভালো লেগেছে, খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। কিন্তু বইটা পড়ে কর্ণের মায়ের চরিত্রে কুন্তীকে ঠিক মততাময়ী পাইনি মনে হয়েছে। ছোটবেলা থেকে 'সত্যবাদী যুধিষ্ঠির' কথাটি শুনেছি। আমিও বহুবার শব্দটা ব্যবহার করেছি কিন্তু বইটি পড়েই বুঝতে পেরেছি আসল ঘটনা।

দাদুর কিস্‌সা

ফাহিমা আহমেদ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গল্পে উনার খালাতো ভাইবোনকে 'আমাদের মহাভারত' শুনাচ্ছিলেন। আমাদের মহাভারত পড়ে আমার ছোট বেলার কথা মনে পড়ে গেল। রাতে কোনোভাবে পড়া শেষ করে সব ভাই বোন মিলে বড় দাদুকে ধরতাম, বলতাম দাদু একটা কিস্‌সা শুনান না। দাদুর কিছু পুঁথি ছিল।

দাদু এক খিলি পানের শর্ত দিয়ে গল্প বলতে রাজি হতো। তিনি গল্প বলতে শুরু করতেন। বেশির ভাগ গল্পে থাকতো রাজা, ছদ্মবেশী রাক্ষসী রানি, রাজপুত্র ও তার পক্ষিরাজ ঘোড়া, উজির পুত্র, আর পাশা খেলার কথা।

মহাভারতের কাহিনি মূলত যযাতির বংশধরদের নিয়ে। লেখক গল্পের শুরুটা করেছিলেন এভাবে-

এক যে ছিলো রাজা... কোন রাজা? মহাভারতে এত রাজা আর তাঁদের বংশধরদের কথা আছে যে, মাথা গুলিয়ে যায়। সত্যিই মাথা গুলিয়ে যায়। প্রথমবার পড়ে শেষের দিকে আসতে আসতে আমি প্রথম দিকটা গুলিয়ে ফেলেছিলাম, পরে আবার দেখে ছক কেটে মিলিয়ে নিলাম কে কার ছেলে।

মহাভারতের কাহিনির মূল হলো কৌরব আর পাণ্ডবরা। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৌরবরা শুরু থেকে পঞ্চপাণ্ডবদের বিরুদ্ধে এবং তাদের নানা রকম অত্যাচার করলেও যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দেখে তার ভাইরা নেই সেখানে বরং রয়েছে দুর্যোধন। একটুখানি অধর্মে তার চার ভাইকে এবং যুধিষ্ঠিরকেও একবার নরকে ঘুরে যেতে হয়।

মহাভারতে জতুগৃহ ত্যাগের পর বনে বনে ঘুরে যখন পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তি ব্রাহ্মণ সেজে একটা গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার পর সেখানে রাক্ষস নিয়ে যে কাহিনীটি হয় তা অনেকটাই প্রাচীন বাংলার মাৎস্যন্যায় ঘটনার সঙ্গে মিলে যায়।

মহাভারতে অর্জুনকে মহানায়ক হিসেবে দেখালেও আমার কাছে সবচেয়ে ভয়াবহ কাণ্ড মনে হয়, একজন দেবতার তুষ্টির জন্য অর্জুন আর শ্রী কৃষ্ণ মিলে খাণ্ডববনে আগুন ধরিয়ে দেওয়াটা।

অমৃতের স্বাদ

জান্নাতুল সাদিয়া পুষ্প

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান/ কাশীরাম দাস কহে, শুনে পূণ্যবান।"

প্রচলিত এ কথাটি পুরোপুরি অনুধাবন করতে না পারলেও, অমৃতের স্বাদটুকু পেয়েছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'আমাদের মহাভারত' বইটি পড়ে। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই মহাকাব্যটি শিশু-কিশোরদের কাছে সহজভাবে তুলে ধরার জন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন 'আমাদের মহাভারত'।

বইটিতে লেখক হিন্দুশাস্ত্রের নানা ইতিহাস থেকে শুরু করে কৌরব-পাণ্ডবদের পরিচয়, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, পঞ্চপাণ্ডবের মাতৃআজ্ঞা পালন, দুর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সবশেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতি সংক্ষেপে গল্পচ্ছলে বর্ণনা করেছেন।

'আমাদের মহাভারত' বইটি মূলত শিশুতোষ বই। কিন্তু আমার কাছে একবারের জন্যও তা মনে হয়নি। সহজ সাবলীল ভাষায় রচিত এ বইটি মহাভারত সম্পর্কে আমার জমানো নানা জিজ্ঞাসার উত্তর মিলিয়েছে। অবশ্যই সবার এই বইটি পড়া উচিত।

লেখা আহ্বান

প্রিয় পাঠক

প্রেক্ষার চতুর্থ সংখ্যাটি হবে উন্মুক্ত।
যে কোন বইয়ের পাঠ পর্যালোচনা লিখে পাঠাতে পারবেন এই সংখ্যায়। তাই নিজের পঠিত পছন্দের বই নিয়ে ঝটপট লিখে ফেলুন চমৎকার একটি 'পাঠ পর্যালোচনা'। লেখাটি ৪০০ থেকে ৮০০ শব্দের এবং বিজয় SutonnyMJ ফন্টের হলে ভালো হয়।

১৫ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত লেখা পাঠানো যাবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

mbarif94@gmail.com
cuabrittimancho2000@gmail.com

[প্রচলিত অর্থে ***'বুক রিভিউ'*** বলতে যা বুঝায় আমাদের ***'পাঠ পর্যালোচনা'*** তা নয়। বুক রিভিউতে বইয়ের আকর্ষণীয় কিছু অংশ তুলে ধরে বইটি পাঠে উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রকাশকগণ বইয়ের কাটতি বাড়ানোর জন্যেও এরকম *'রিভিউ কন্টেন্ট'* তৈয়ার করে থাকেন।

আমরা পাঠ পর্যালোচনা পরিভাষাটিকে আরেকটু ওজনদার মনে করি। পাঠ পর্যালোচনায় পাঠক নির্দিষ্ট কোন বইয়ের ব্যাপারে নিজের ভালোলাগা-মন্দলাগা ব্যক্ত করবেন। এই ভালো-মন্দের পরিসরে ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম, মূল্যবোধ, সাহিত্যরুচি ইত্যাদির সবক'টিই বিরাজমান থাকবে। পর্যালোচনার প্রয়োজনে পাঠ পর্যালোচনায় বইয়ের সমাপ্তি বা মূল চরিত্রের পরিণতিও জরুর আসতে পারে; প্রচলিত বুক রিভিউতে যা দূষণীয় বলে বিবেচিত হয়। - ***সম্পাদক***]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ